أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/Q) www.motaher21.net

وَلَا تَنفَعُهَا شَفٰعَةٌ

কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না।

No intercession will be useful for anyone..

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১২২

يٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ اذۡكُرُوۡا نِعۡمَتِیَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَ اَنِّیۡ فَضَّلۡتُكُمۡ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ

হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের আমি যে নিয়ামত দান করেছিলাম এবং বিশ্বের জাতিদের ওপর তোমাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম তার কথা স্মরণ করো।

১২৩.নং আয়াতে

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

আর তোমরা সেই দিনের ভয় করো, যে দিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কারো পক্ষ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবে না এবং কারো সুপারিশ ফল দিবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

১২২-১২৩ নং আয়াতের তাফসীর:

এখান থেকে আর একটি ধারাবাহিক ভাষণ শুরু হচ্ছে। এখানে পরিবেশিত বক্তব্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন।

একঃ হজরত নূহের পরে হযরত ইবরাহীম প্রথম বিশ্বজনীন নবী। মহান আল্লাহ তাঁকে ইসলামের বিশ্বজনীন দাওয়াত ছড়াবার দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। প্রথমে তিনি নিজে সশরীরে ইরাক থেকে মিসর পর্যন্ত এবং সিরিয়া ও ফিলিস্তীন থেকে নিয়ে আরবের মরু অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান পর্যন্ত বছরের পর বছর সফর করে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের (অর্থাৎ ইসলাম) দিকে আহবান করতে থাকেন। অতঃপর এই মিশন সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। পূর্ব জর্দানে নিজের ভাতিজা হযরত লূতকে নিযুক্ত করেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে নিযুক্ত করেন নিজের ছেলে হযরত ইসহাককে এবং আরবের অভ্যন্তরে নিযুক্ত করেন নিজের বড় ছেলে হযরত ইসমাঈলকে। তারপর মহান আল্লাহর নির্দেশে মক্কায় কা' বাগৃহ নির্মাণ করেন এবং আল্লাহর নির্দেশ মতো এটিকেই এই মিশনের কেন্দ্র গণ্য করেন।

দুইঃ হযরত ইবরাহীমের বংশধারা দু' টি বড় বড় শাখায় বিভক্ত হয়। একটি শাখা হচ্ছে, হযরত ইসমাঈলের সন্তান-সন্ততিবর্গ। এরা আরবে বসবাস করতো। কুরাইশ ও আরবের আরো কতিপয় গোত্র এরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর যেসব আরব গোত্র বংশগত দিক দিয়ে হযরত ইসমাঈলের সন্তান ছিল না তারাও তাঁর প্রচারিত ধর্মে কমবেশী প্রভাবিত ছিল বলেই তাঁর সাথেই নিজেদের সম্পর্ক জুড়তো। দ্বিতীয় শাখাটি ছিল হযরত ইসহাকের সন্তানবর্গের। এই শাখায় হযরত ইয়াকুব, হযরত ইউসূফ, হযরত মূসা, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত ইয়াহ্হিয়া, হযরত ঈসা প্রমুখ অসংখ্য নবী জন্মগ্রহণ করেন। আর ইতিপূর্বে বলেছি, যেহেতু হযরত ইয়াকুবের আর এক নাম ছিল ইসরাঈল, তাই তাঁর বংশ বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত হয়। তাঁর প্রচার অভিযানের ফলে যেসব জাতি তাঁর দ্বীন গ্রহণ করে তারা তার মধ্যে নিজেদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত করে দেয় অথবা তারা বংশগতভাবে তাদের থেকে আলাদা থাকলেও ধর্মীয়ভাবে তাদের অনুসারী থাকে। এই শাখায় অবনতি ও অধঃপতন সূচিত হলে প্রথমে ইহুদিবাদ ও পরে খৃস্টবাদের উদ্ভব হয়।

তিনঃ হযরত ইবরাহীমের আসল কাজ ছিল সমগ্র দুনিয়াবাসীকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহবান জানানো এবং আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ ও সংশোধিত করে গড়ে তোলা। তিনি নিজে ছিলেন আল্লাহর অনুগত। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান অনুযায়ী নিজের জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার পরিচালনা করতেন, সারা দুনিয়ায় এই জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটাতেন এবং চেষ্টা করতেন যাতে সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভুর অনুগত হয়ে এ দুনিয়ায় জীবন যাপন করে। এই মহান ও বিরাট কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে তাঁকে বিশ্ব নেতার পদে অভিষিক্ত করা হয়। তারপর তাঁর বংশধারা থেকে যে শাখাটি বের হয়ে হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুবের নামে অগ্রসর হয়ে বনী ইসরাঈল নাম ধারণ করে সেই শাখাটি তার এ নেতৃত্বের উত্তরাধিকার

লাভ করে। এই শাখায় নবীদের জন্ম হতে থাকে এবং এদেরকেই সত্য-সঠিক পথের জ্ঞান দান করা হয়। বিশ্বের জাতিসমূহকে সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব এদের ওপর সোপর্দ করা হয়। এটি ছিল আল্লাহর মহান অনুগ্রহ ও নিয়ামত। মহান আল্লাহ এ বংশের লোকদেরকে তাই একথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এ শাখাটি হযরত সুলাইমানের আমলে বাইতুল মাকদিসকে নিজেদের কেন্দ্র গণ্য করে। তাই যতদিন পর্যন্ত এ শাখাটি নেতৃত্বের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিল ততদিন পর্যন্ত বাইতুল মাকদিসই ছিল দাওয়াত ইলাল্লাহ---মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান জানাবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র।

চারঃ পেছনের দশটি রুকু' তে মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে তাদের ঐতিহাসিক অপরাধসমূহ এবং কুরআন নাযিল হবার সময়ে তাদের যে অবস্থা ছিল তা হুবহু বর্ণনা করেছেন। এ সঙ্গে তাদেরকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা আমার নিয়ামতের চরম অমর্যাদা করেছো। তোমরা কেবল নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকো নি বরং নিজেরাও সত্য ও সততার পথ পরিহার করেছো। আর এখন তোমাদের একটি ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী ছাড়া তোমাদের সমগ্র দলের মধ্যে আর কোন যোগ্যতা অবশিষ্ট নেই।

পাঁচঃ অতঃপর এখন তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব ইবরাহীমের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার নয়। বরং নবী ইবরাহীম নিজে যে নিষ্কলুষ আনুগত্যের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়েছিলেন এটি হচ্ছে তারই ফসল। যারা ইবরাহীমের পথে নিজেরা চলে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে চালাবার দায়িত্ব পালন করে একমাত্র তারাই এই নেতৃত্বের যোগ্যতা লাভ করতে পারে। যেহেতু তোমরা এ পথ থেকে সরে গেছো এবং এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছো তাই নেতৃত্বের পদ থেকে তোমাদের অপসারিত করা হচ্ছে।

ছয়ঃ সঙ্গে সঙ্গে ইশারা-ইঙ্গিতে একথাও বলে দেয়া হচ্ছে, যেসব অইসরাঈলী জাতি মূসা ও ঈসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে নিজেদের সম্পর্ক জুড়েছিল তারাও ইবরাহীমের পথ থেকে সরে গেছে। এই সঙ্গে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আরবের মুশরিকরাও ইবরাহীম ও ইসমাঈলের সাথে নিজেদের সম্পর্ক রয়েছে বলে গর্ব করে বেড়ায় কিন্তু তারা আসলে নিজেদের বংশ ও গোত্রের অহংকারে মত্ত হয়ে পড়েছে। ইবরাহীম ও ইসমাঈলের পথের সাথে এখন তাদের দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। কাজেই তাদের কেউই বিশ্ব নেতৃত্বের যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না।

সাতঃ আবার একথাও বলা হচ্ছে, এখন আমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বংশের দ্বিতীয় শাখা বনী ইসরাঈলের মধ্যে এমন এক নবীর জন্ম দিয়েছি যার জন্য ইবরাহীম ও ইসমাঈল উভয়েই দোয়া করেছিলেন। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও অন্যান্য সকল নবী যে পথ অবলম্বন করেছিলেন তিনিও সেই একই পথ অবলম্বন করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় যত নবী ও রসূল এসেছেন তিনি ও তাঁর অনুসারীরা তাদের সবাইকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেন। সকল নবী বিশ্ববাসীকে যে পথের দিকে আহবান জানিয়েছেন তিনি ও তাঁর অনুসারীগণও মানুষকে সেদিকে আহবান জানান। কাজেই যারা এ নবীর অনুসরণ করে এখন একমাত্র তারাই বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের যোগ্যতা ও অধিকার রাখে।

আটঃ নেতৃত্ব পরিবর্তনের ঘোষণার সাথে সাথেই স্বাভাবিকভাবেই কিব্‌লাহ পরিবর্তনের ঘোষণা হওয়াও জরুরি ছিল। যতদিন বনী ইসরাঈলদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠত ছিল ততদিন বাইতুল মাকদিস ছিল ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্র এবং সেটিই ছিল সত্যপন্থীদের কিব্‌লাহ। শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীগণও ততদিন বাইতুল মাকদিসকেই তাঁদের কিব্‌লাহ বানিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বনী ইসরাঈলকে এ পদ থেকে যথারীতি অপসারিত করার পর বাইতুল মাকদিসের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব আপনা-আপনি খতম হয়ে গেল। কাজেই ঘোষণা করে দেয়া হলো, যেখান থেকে এ শেষ নবীর দাওয়াতের সূচনা হয়েছে সেই স্থানটিই হবে এখন আল্লাহর দ্বীনের কেন্দ্র। আর যেহেতু শুরুতে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দাওয়াতের কেন্দ্রও এখানে ছিল তাই আহ্‌লি কিতাব ও মুশরিকদের জন্যও এ স্থানটির অর্থাৎ কা’ বার কেন্দ্র হবার সর্বাধিক অধিকারের দাবী স্বীকার করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অবশ্যি হঠধর্মীদের কথা আলাদা। তারা সত্যকে সত্য জেনেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ আনতে থাকে।

নয়ঃ উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার নেতৃত্ব ও কা’ বার কেন্দ্র হবার কথা ঘোষণা করার পরই মহান আল্লাহ ১৯ রুকূ ’ থেকে সূরা বাকারার শণেষ পর্যন্ত আলোচনায় ধারাবাহিক হেদায়াতের মাধ্যমে এ উম্মাতের জীবন গঠন ও জীবন পরিচালনার জন্য বিধান দান করেছেন।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১২৪

وَ اِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ

স্মরণ করো যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সেসব পরীক্ষায় সে পুরোপুরি উত্‌রে গেলো, তখন তিনি বললেনঃ “আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতার পদে অধিষ্ঠিত করবো।” ইবরাহীম বললোঃ “আর আমার সন্তানদের সাথেও কি এই অঙ্গীকার?” জবাব দিলেনঃ “আমার এ অঙ্গীকার যালেমদের ব্যাপারে নয়।”

১২৪ নং আয়াতের তাফসীর:

ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন একজন মহান নেতা

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ্‌র বন্ধু ইব্রাহীম (আঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তাঁকে তাওহীদের ব্যাপারে পৃথিবীর ইমাম পদে অধিষ্ঠিত করেছেন। যিনি বহু কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে অটলতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেনঃ ‘হে নবী! যেসব মুশরিক ও আহলে কিতাব ইবরাহীম (আঃ) এর ধর্মের ওপর থাকার দাবী করছে তাদেরকে ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক মহান আল্লাহ্‌র আদেশ পালন ও তাঁর প্রতি আনুগত্যের ঘটনাবলী শুনিয়ে দাও, তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে, একমুখী ধর্ম ও ইবরাহীমের আদর্শের ওপর কারা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তারা নাকি তুমিও তোমার সহচরবৃন্দ?’ কুর’ আন মাজীদের মধ্যে এক জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ ﴿وَاِبْرٰهِيْمَالَّذِيْوَفّٰٓى﴾

‘আর ইবরাহীমের কিতাব, যে পালন করেছিলো তার দায়িত্ব।’ (৫৩ নং সূরা আন-নাজম, আয়াত নং ৩৭)

অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا١ؕ وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَۙ(۱۲۰) شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهِ١ؕ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ(۱۲۱) وَاٰتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً١ؕ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ(۱۲۲) ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا١ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

‘নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলো এক উম্মাত মহান আল্লাহ্‌র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; মহান আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। আমি তাকে দুনিয়ায় ও আখিরাতে মঙ্গল দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করো এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। (১৬ নং সূরা আন-নাহল, আয়াত নং ১২০-১২৩) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ١ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا١ۚ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

তুমি বলোঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন, এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিলো। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। (৬ নং সূরা আন ‘আম, আয়াত নং ১৬১) কুর’ আনুল হাকীমের অন্য স্থানে ইরশাহ হচ্ছেঃ

﴿مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّ لَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا١ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ(۶۷) اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا١ؕ وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ﴾

‘ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিলো না এবং খ্রিষ্টানও ছিলো না, বরং সে সুদৃঢ় মুসলিম ছিলো এবং সে মুশরিকদের অর্থাৎ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। নিঃসন্দেহে ঐ সব লোক ইবরাহীমের নিকটতম যারা তার

অনুসরণ করেছে এবং এই নবী এবং তাঁর সাথের মু' মিনগণ; এবং মহান আল্লাহ বিশ্বাসীগণের অভিভাবক। (৩ নং আল 'ইমরান, আয়াত নং ৬৭-৬৮) ابْتِلَاءُ শব্দটির অর্থ হচ্ছে আয্মায়িশ বা পরীক্ষা।

ইব্রাহীম (আঃ) এর পরীক্ষা, كَلِمَاةٌ শব্দের তাফসীর এবং পরীক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর কৃতকার্যতার সংবাদ

كَلِمَات শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শারী 'আত' 'আদেশ' 'নিষেধ" ইত্যাদি। كَلِمَات শব্দের ভাবার্থ كَلِمَات شَرْعِيَة ও হয়। যেমন মারইয়াম (আঃ) সম্বন্ধে ইরশাহ হচ্ছেঃ ﴿وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا﴾

'আর সে তার রবের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছিলো; সে ছিলো অনুগতদের একজন। ' (৬৬ নং সূরা তাহরীম, আয়াত নং ১২)

আবার كَلِمَات এর ভাবার্থ كَلِمَاتشَرْعِيَة ও হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَتَمَّتْكَلِمَتُرَبِّكَصِدْقًاوَّعَدْلًا﴾

'আর তোমার রবের 'আদেশ' সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ।' (৬ নং সূরা আন 'আম, আয়াত নং ১১৫)

এই كَلِمَاة গুলো হয়তোবা সত্য সংবাদ, অথবা সুবিচার সন্ধান। মোট কথা, এই বাক্যগুলো পুরা করার প্রতিদান স্বরূপ ইবরাহীম (আঃ) ইমামতির পদ লাভ করেন।

কোন্ কথাগুলি দ্বারা ইবরাহীম (আঃ) পরীক্ষিত হয়েছিলেন

মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) কে কিভাবে পরীক্ষা করেছিলেন সেই বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। ইবনে 'আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রেও কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন 'আবদুর রাজ্জাক (রহঃ) ইবনে 'আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বলেনঃ মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) কে ধর্মীয় 'আমল তথা হাজ্জ দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। (তাফসীর তাবারী ৩/১৩)

আবু ইসহাক (রহঃ) ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাফসীর তাবারী ৩/১৩) ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 'স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম (আঃ) এর রাব্ব তাঁকে কয়েকটি বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন' এর অর্থ হলো মহান আল্লাহ তাঁকে তাহারাত অর্থাৎ পবিত্রতা, ওযূ দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন। পাঁচটি শরীরের ওপরের অংশের এবং পাঁচটি শরীরের নীচের অংশের মাধ্যমে। ওপরের অংশগুলো হলো মোচ কাটা, চুল কাটা, কুলি

করা, নাকে পানি দিয়ে তা ফেলে দেয়া এবং মিসওয়াক করা। আর নীচের অংশগুলো হলো নখ কাটা, নাভীর নীচের অংশের লোম কাটা, খাতনা করা, বগলের লোম তুলে ফেলা এবং শৌচক্রিয়া সম্পাদন করা। (মুসনাদে ‘আবদুর রাজ্জাক ১/৫৭)

ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) বলেন যে, একই বর্ণনা করেছেন সা ‘ঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), শা ‘বী (রহঃ), নাখ ‘ঈ (রহঃ). আবূ সালিহ (রহঃ) আবূ জাল্‌দ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৫৯)

সহীহ মুসলিমে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ ‘দশটি কাজ হচ্ছে প্রাকৃতিক ও ধর্মের মূলঃ (১) গোঁফ ছাটা, (২) শ্মশ্রু লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) নাকে পানি দেয়া, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙ্গুলের মাঝখানের অংশগুলো ধৌত করা, (৭) বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা, (৮) নাভীর নীচের লোম কেটে ফেলা, (৯) শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করা; বর্ণনাকারী বলেনঃ ‘দশমটি আমি ভুলে গেছি। (১০) সম্ভবতঃ তা কুলি করা হবে।’ (সহীহ মুসলিম ১/২২৩) সহীহুল বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেনঃ

‘পাঁচটি কাজ প্রকৃতির অন্তর্গত। (১) খাৎনা করা, (২) নাভির নীচের লোম কেটে ফেলা, (৩) গোঁফ কাটা, (৪) নখ কাটা এবং (৫) বগলের লোম উঠিয়ে ফেলা।’ (ফাতহুল বারী ১০/৩৪৭, সহীহ মুসলিম ১/২২২)

ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ)-এর একটি সূত্র উল্লেখ করে বলেন, সেই কালিমাগুলো ছিলো দশটি যার ছয়টি ছিলো মানুষের মধ্যে আর চারটি ছিলো ইসলামের শি ‘আর এর মধ্যে। যে ছয়টি কালিমা মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট তা হলো ১. নাভীর ও বগলের নীচের চুল কাটা। ২. খাৎনা করা। ৩. নখ কাটা ৪. মোচ খাটো করা। ৫. মিসওয়াক করা। ৬. জুমু ‘আর দিন গোসল করা। আর চারটি ছিলো ইসলামের শি ‘আর তা হলো, ১. বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, ২. সাফা মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো। ৩. কংকর নিক্ষেপ করা এবং ৪. তাওয়াফে ইফাযা করা। (সনদ সহীহ। তাফসীর ইবনু আবি হাতিম)

‘আবদুল্লাহ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে পুরো ইসলাম। এর তিনটি অংশ রয়েছে। দশটির বর্ণনা আছে সূরাহ্ বারা’ আতের মধ্যে التئبون হতে مومنين পর্যন্ত। অথাৎ তাওবাহ করা, ইবাদত করা, প্রশংসা করা, আল্লাহ্‌র পথে দৌড়ান, রুকূ ‘ করা, সাজদাহ করা, ভালো কাজে আদেশ করা, মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা, মহান আল্লাহ্‌র সীমার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ঈমান আনা।

দশটির বর্ণনা রয়েছে সূরাহ মু’ মিনূন এর قدافلح হতে يحفظون পর্যন্ত এরই মধ্যে এবং সূরা আল মা ‘আরিজ এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ বিনয় ও নম্রতার সাথে সালাত আদায় করা, বাজে কথা ও কাজ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যাকাত প্রদান করা, লজ্জা স্থানকে রক্ষা করা, অঙ্গীকার করা, সালাত প্রতিষ্ঠায় মগ্ন থাকা ও তার হিফাযত করা, কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, শাস্তিকে ভয় করতে থাকা এবং সত্য সাক্ষ্যের ওপর অটল থাকা।

দশটির বর্ণনা সূরাহ আল-আহযাবের أنالمسلمين হতে عظيم পর্যন্ত এর মধ্যে রয়েছে। অথাৎ ইসলাম গ্রহণ করা, ঈমান রাখা , কুর’ আন মাজীদ পাঠ করা, সত্য কথা বলা, ধৈর্য ধারণ করা, বিনয়ী হওয়া, সাওম রাখা, ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা, মহান আল্লাহকে সদা স্মরণ করা। এই এ ত্রিশটি নির্দেশ যে পালন করবে সেই পুরোপুরি ইসলামের অনুসারী হবে এবং মহান আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে রক্ষা পাবে।

ইব্রাহীম (আঃ) এর كلمات এর মধ্যে তার স্বীয় গোত্র হতে পৃথক হওয়া তদানীন্তন বাদশাহ হতে নির্ভয় হয়ে থাকা ও তাবলীগ করা, অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র পথে যে বিপদ এসেছে তাতে ধৈর্য ধারণ করা, তারপর দেশ ও ঘর বাড়ি মহান আল্লাহ্‌র পথে ছেড়ে দিয়ে হিজরত করা, অতিথির সেবা করা, মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জীবনের ও ধন মালের বিপদাপদ সহ্য করা এমনকি নিজের ছেলেকে নিজের হাতে মহান আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করা। (তাফসীরে ‘আব্দুর রাজ্জাক, প্রথম খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ১১৪, তাফসীরে ত্বাবারী ৩/১৯৩৫) মহান আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ইব্রাহীম (আঃ) এই সব নির্দেশই পালন করেছিলেন। সূর্য, চন্দ্র, ও তারকারাজির দ্বারা ও তার পরীক্ষা নেয়া হয়েছিলো। (তাফসীরে ত্বাবারী ৩/১৯৩৬) ইমামতি, মহান আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণের নির্দেশ, হাজ্জের নির্দেশাবলী, মাকামে ইবরাহীম, বায়তুল্লাহতে অবস্থানকারীদের আহার্য্য এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তার ধর্মের ওপর প্রেরণ ইত্যাদির মাধ্যমেও তার পরীক্ষা নেয়া হয়েছিলো।

ইবনে আবি হাতিম (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে একটি সূত্র উল্লেখ করেছেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ তাঁকে বলেন, হে প্রিয় তোমাকে আমি পরীক্ষা করছি, কি হয় তাই দেখছি। তখন তিনি বলেনঃ হে আমার প্রভু! আমাকে জনগণের ইমাম বানিয়ে দিন। এই কা ‘বাকে মানুষের জন্য পূর্ণ মিলন কেন্দ্রে পরিণত করুন। এখানকার অধিবাসীদের নিরাপত্তা দান করুন। আমাদেরকে মুসলমান ও অনুগত বান্দা করে নিন। আমার বংশধরের মধ্যে আপনার অনুগত একটি দল রাখুন। এখানকার অধিবাসীদেরকে ফলের আহার্য দান করুন। এই সবই মহান আল্লাহ পুরো করেন এবং সবই তাকে দান করেন। (সনদ সহীহ। তাফসীরে ইবনে আবি হাতিম) শুধুমাত্র তার একটি আশা আল্লাহ তা ‘আলা পুরো করেননি। তা হচ্ছে এই যে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেনঃ হে মহান আল্লাহ! আমার সন্তানদেরকে ইমামতি দান করুন। এর উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন, আমার এ বিরাট দায়িত্ব অত্যাচারীদের ওপর অর্পিত হতে পারে না। كلمات এর ভাবার্থ এর সঙ্গীয় আয়াতসমূহও হতে পারে।

মুওয়াত্তা, ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে যে,সর্বপ্রথম খাৎনার প্রচলনকারী, অতিথি সেবাকারী, নখ কর্তনের প্রথা চালুকারী, গোঁফ ছাঁটার নিয়ম প্রবর্তনকারী এবং সাদা চুল দর্শনকারী হচ্ছেন ইব্রাহীম (আঃ)। সাদা চুল দেখে তিনি মহান আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ হে প্রভু! এটা কি? আল্লাহ তা ‘আলা উত্তরে বলেছিলেনঃ এ হচ্ছে সম্মান ও পদমর্যাদা। তখন তিনি বলেন, হে মহান আল্লাহ! তাহলে এটা আরো বেশি করুন। (হাদীসটি সহীহ। তাফসীরে কুরতুবী-২/১০৫ পৃষ্ঠা, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ২/৪/৯২২) সর্বপ্রথম মিম্বারের ওপর ভাষণ দানকারী, দূত প্রেরণ কারী তরবারি চালনাকারী, মিসওয়াক কারী, পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদনকারী এবং পায়জামা পরিধানকারীও হচ্ছেন ইব্রাহীম (আঃ)।

মু ‘আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি যদি মিম্বার নির্মাণ করি তবে আমার পিতা ইব্রাহীম (আঃ)তো তা নির্মাণ করেছিলেন। আমি যদি হাতে ছড়ি রাখি তবে এটাও ইব্রাহীম (আঃ) এরই সুন্নাত। (হাদীসটি য ‘ঈফ জিদ্দান) তবে এটি একটি দুর্বল হাদীস। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

একটি হাদীসে রয়েছে, আনাস (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেন, মহান আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে وابرحيمالذيوفى ‘সেই ইবরাহীম (আঃ) যে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে’ (৫৭ নং সূরাহ আল হাদীদ, আয়াত ৩৭) কেন বলছেন তা তোমাদেরকে বলবো কি? তার কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় পাঠ করতেনঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ۝وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ۝ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ ﴾وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا١ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

‘অতএব তোমরা মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও আর সকালে, আর অপরাহ্নে ও যোহরের সময়ে। আর আসমানসমূহে ও যমীনে প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই। তিনি জীবন্তকে বের করেন মৃত থেকে আর মৃতকে বের করেন জীবন্ত থেকে। যমীনকে তিনি পুনরায় জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর, এভাবেই তোমাদের বের করা হবে।’ (৩০ নং সূরা আর রূম, আয়াত ১৭-১৯। তাফসীরে ত্বাবারী ১/১৫/১৯৩৮, মুসনাদ আহমাদ ৩/৪৩৯, সনদ য ‘ঈফ)

একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি প্রত্যহ চার রাকা ‘আত সালাত পড়তেন। (হাদীস য ‘ঈফ জিদ্দান। তাফসীরে ত্বাবারী-৩/১৬/১৯৩৯) কিন্তু এ দু’ টি হাদীসই দুর্বল এবং এগুলোর মধ্যে কোন কোন বর্ণনাকারী দুর্বল। এগুলো দুর্বল হওয়ার বহু কারণ রয়েছে বরং দুর্বলতার কথা উল্লেখ না করে এগুলোর বর্ণনা করাই জায়িয নয়। রচনারীতি দ্বারাও এগুলোর দুর্বলতা প্রমাণিত হচ্ছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ ইব্রাহীম (আঃ) এর كَلِمَات এর মধ্যে তাঁর স্বীয় গোত্র হতে পৃথক হওয়া, তদানীন্তন বাদশাহ্‌ হতে নির্ভয় হয়ে থাকা ও তাবলীগ করা, অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র পথে চলতে গিয়ে যে বিপদ এসেছে তাতে ধৈর্য ধারণ করা, তারপর দেশ ও ঘর-বাড়ি মহান আল্লাহ্‌র পথে ছেড়ে দিয়ে হিজরত করা, অতিথির সেবা করা, ধন সম্পদের বিপদাপদ সহ্য করা এমনকি মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের জীবন ও ছেলেকে মহান আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করা। মহান আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ইবরাহীম (আঃ) এই সমুদয় নির্দেশই পালন করেছিলেন। সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজরি দ্বারাও তাঁর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিলো। ইমামতি, মহান আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণের নির্দেশ, হাজ্জের নির্দেশাবলী, মাকামে ইবরাহীম, বায়তুল্লাহয় অবস্থানকারীদের আহার্য এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর ধর্মের ওপর প্রেরণ ইত্যাদির মাধ্যমেও তাঁর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিলো। মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) কে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করার পর এবার এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। মহান আল্লাহ তাঁকে বলেনঃ ﴾اَسْلِمْ١ۙقَالَاَسْلَمْتُلِرَبِّالْعٰلَمِيْنَ﴿

‘তুমি আনুগত্য স্বীকার করো; সে বলেছিলো, আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।’ (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৩১)

অন্যায় দ্বারা মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়না

ইবরাহীম (আঃ) তাঁর ইমামতির সুসংবাদ শোনা মাত্রই তাঁর সন্তানদের জন্য এই প্রার্থনা জানান এবং তা গৃহীতও হয়। কিন্তু সাথে সাথে তাঁকে বলা হয়ে যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকে অবাধ্য হবে, তাদের ওপর তাঁর অঙ্গীকার পৌঁছবে না এবং তাদেরকে ইমাম করা হবে না। সূরা ‘আনকাবূতে এ আয়াতের ভাবার্থ পরিস্কার হয়েছে। ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ প্রার্থনা গৃহীত হয়। সেখানে রয়েছেঃ

﴿وَجَعَلْنَافِيْذُرِّيَّتِهِاالنُّبُوَّةَوَالْكِتٰبَ﴾

‘আর তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব।’ (২৯ নং সূরা আনকাবূত, আয়াত নং ২৭)

ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরে যতো রাসূল (আঃ) এসেছেন, সবাই তাঁর বংশধর ছিলেন এবং যতো আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সবই তাঁর সন্তানদের ওপরই হয়েছে। এখানে এটাও সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে অনেকে অত্যাচারীও হবে।

ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, অত্যাচারীকে ইমাম নিযুক্ত করা যাবে না। যালিম' এর ভাবার্থ কেউ কেউ মুশরিকও নিয়েছেন। عهد এর ভাবার্থ নির্দেশ। ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যালিমকে কোন কিছুর ওলী ও নেতা নিযুক্ত করা উচিত নয়, যদিও সে ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর হয়। কেননা তার প্রার্থনা তাঁর সন্তানদের মধ্যে হতে সৎ লোকদের ব্যাপারে গৃহীত হয়েছিলো। এর অর্থ এটাও হতে পাবে যে,যালিমের কাছে কোন অঙ্গীকার করলে তা পুরো করা হবে না, বরং ভেঙে দেয়া হয়। আবার ভাবার্থ এটাও হতে পারে যে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ মঙ্গলের অঙ্গীকার তার ওপর প্রয্যেজ্য নয়। দুনিয়ায় সে সুখে শান্তিতে আছে তা থাক, কিন্তু পরকালে তার কোন অংশ নেই।

عهد এর অর্থ ধর্মও করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমার সমস্ত সন্তান ধর্মভীরু হবে না। কুর’ আন মাজীদের মধ্যে অন্য জায়গায় রয়েছেঃ

﴿وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّ ظَالِمٌ لِّنَفْسِه مُبِيْنٌ﴾ আর আমি বরকত দিলাম তাকে আর ইসহাককে; তাদের দু’ জনের বংশধরদের কতিপয় সৎকর্মশীল। আর কতিপয় নিজেদের প্রতি সুস্পষ্ট যুলমকারী।’

(৩৭ নং সূরা আস-সাফফাত, আয়াত:১১৩) ‘আলী ইবনে আবূ তালিব বলেন, لا طاعة إلا في المعروف ‘কেবল কল্যাণমূলক কাজেই আনুগত্য করতে হবে।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী-১৩/১৩০/৭১৪৫, সহীহ মুসলিম-৩/৩৯/১৪৬৯, সুনান আবূ দাউদ-৩/৪০/২৬২৫)

ইবনে খুওয়াইয মান্দাদ আল মালিকী (রহঃ) বলেন যে, অত্যাচারী ব্যক্তি খালীফা, বিচারক, মুফতী, সাক্ষী এবং বর্ণনাকারী হতে পারে না।

যেসব কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁকে বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করার যোগ্য প্রমাণ করেছিলেন কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সত্যের আলো তাঁর সামনে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর থেকে নিয়ে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমগ্র জীবন ছিল কুরবানী ও ত্যাগের মূর্ত প্রতীক। দুনিয়ার যেসব বস্তুকে মানুষ ভালোবাসতে পারে এমন প্রতিটি বস্তুকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সত্যের জন্য কুরবানী করেছিলেন। দুনিয়ার যে সমস্ত বিপদকে মানুষ ভয় করে সত্যের খাতিরে তার প্রত্যেকটিকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন।

অর্থাৎ এই অঙ্গীকারটি তোমার সন্তানদের কেবলমাত্র সেই অংশটির সাথে সম্পর্কিত যারা সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ ও সৎকর্মশীল। তাদের মধ্য থেকে যারা যালেম তাদের জন্য এ অঙ্গীকার নয়। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, পথভ্রষ্ট ইহুদিরা ও মুশরিক বনী ইসরাঈলরা এ অঙ্গীকারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

[১] যে যে বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কুরআনে শুধু (كَلِمَات) (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসংগে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশী অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তাফসীরকারক ইবনে-জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তাই। এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইঃ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মুল্যবান পোষাক উপহার দেয়া। তাই তাকে বিভিন্ন রকমের কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমনকি তার আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতি-নীতির বিপরীত একটি সনাতন দ্বীন তাকে দেয়া হয়। জাতিকে এ দ্বীনের দিকে আহবান জানানোর গুরুদায়িত্ব তার কাধে অর্পণ করা হয়। তিনি নবীসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহ্‌র দিকে আহবান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তিপূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে সমগ্র জাতি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ নমরূদ ও তার পরিবারবর্গ তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ্‌র খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্য পেশ

করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন, ‘হে আগুন! ইবরাহীমের উপর সুশীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও। [সূরা আল-আম্বিয়া ৬৯]

এ পরীক্ষা শেষ হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হয়। ইবরাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র জন্মভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন। সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, স্ত্রী হাজেরা ও তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ইসমাঈল ''আলাইহিস সালাম-কে সংগে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন। [ইবনে কাসীর] জিবরীল ''আলাইহিস সালাম আসলেন এবং তাদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। চলতে চলতে যখন শুস্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল (যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হল। আল্লাহ্র বন্ধু তার রবের ভালবাসায় এ জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই তাদের থাকতে বললেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হলো না। অতঃপর ইবরাহীম ''আলাইহিস সালাম নির্দেশ পেলেন যে, স্ত্রী হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় ফিরে যান। আল্লাহ্র বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি - স্ত্রীকে একটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরীও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হাজেরা তাকে চলে যেতে দেখে বললেন, আপনি কি আল্লাহ্র কোন নির্দেশ পেয়েছেন? ইবারাহীম ‘আলাইহিস সালাম বললেন, ‘হ্যা’ । আল্লাহ্র নির্দেশের কথা জানতে পেরে হাজেরা বললেন, যান, যে প্রভূ আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না। [বুখারী ৩৩৬৪]

অতঃপর হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। সাথের সংরক্ষিত পানি ফুরিয়ে যাওয়ায় এক সময় দারুন পিপাসা তাকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে সাফা’ ও ‘মারওয়া পাহাড়ে বার বার উঠা-নামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন মানুষও দৃষ্টিগোচর হলো না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাতবার ছুটোছুটি করে তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য হজের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হাজেরা যখন নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্র রহমত নাযিল হল। জিবরাঈল ‘আলাইহিস সালাম আগমন করলেন এবং শুস্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। [বুখারী ৩৩৬৫]

বর্তমানে এ ধারার নামই যমযম। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জীব-জন্তু আগমন করল। জীব-জন্তু দেখে মানুষ এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাব পত্রও সংগৃহীত হল।

ইসমাঈল ‘আলাইহিস সালাম নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেল। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র ইংগিতে মাঝে মাঝে এসে স্ত্রী হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

“বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায়? পিতৃভক্ত বালক বলল, পিতা! আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ্ এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল পাবেন” । [সূরা আস-সাফফাতঃ ১০২]

এর পরবর্তী ঘটনা সবার জানা আছে যে, ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করলেন। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত থেকে এর পরিপূরক নাযিল করে তা কুরবানী করার আদেশ দিলেন। এই রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন খলীলুল্লাহ ‘আলাইহিস সালাম-কে করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতাও তার উপর আরোপ করা হল। তন্মধ্যে দশটি কাজ 'খাসায়েলে ফিতরাত’ বা প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত, ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা আল-বারাআতে, দশটি সূরা আল-মুমিনুনে এবং দশটি সূরা আল-আহ্‌যাবে বর্ণিত হয়েছে। [ইবনে কাসীর] ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উপরোদ্‌ধৃত উক্তির দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলিমদের জন্য যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কুরআনে উল্লেখিত (كَلِمَات) যেসব বিষয়ে খলীলুল্লাহ্ ‘আলাইহিস সালাম-এর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে বলে বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে।

[২] এ আয়াত দ্বারা একদিকে বুঝা গেল যে, ইবরাহীম ''আলাইহিস সালাম-কে সাফল্যের প্রতিদানে মাবনসমাজের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, অপরদিকে মানব সমাজের নেতা হওয়ার জন্য যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্থিব পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্থিব পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় সূরা আল-বারাআত বা আত-তাওবার ১১২ নং আয়াত, সূরা আল-মুমিনূন এর ১-১১ এবং সূরা আল-আহযাবের ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুনান্বিত হওয়া শর্ত। কুরআনের অন্য এক জায়গায় এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, “যখন তারা সবর করলো এবং আমার নিদর্শনাবলীতে নিশ্চিত বিশ্বাসী হল, তখন আমরা তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে” । [সূরা আস-সাজদাহ:২৪] এই আয়াতে বর্ণিত (صَبر) হলো শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা। আর (يَقِيْن) হলো কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা। কারও মধ্যে এগুলোর পূর্ণতার ভিত্তিতেই নেতৃত্বের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

[৩] আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নবী ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তার সাফল্য এবং পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম যখন স্নেহ পরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যেও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্য একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেয়া হল। এতে খলীলুল্লাহর প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও যালিম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌছানো সন্তানদের জন্য এ দো’ আর মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্য-মান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। খলীলুল্লাহ ‘আলাইহিস সালাম-এর এ দোআটিও কবুল হয়েছে। তার বংশধরদের মধ্যে কখনো সত্যদ্বীনের অনুসারী ও আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলিয়াত আমলে আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার, তখনো ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্র আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন, যায়েদ ইবনে আমর, ওরাকা ইবন নওফাল এবং কেস ইবন সায়েদা প্রমূখ।

আল্লাহ তা ‘আলা তাঁর খলিল ইবরাহীম (রাঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি ইবরাহীমকে কিছু “কালিমা ” দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। এ আয়াত “كلمات” বা বাক্য দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে মুফাসসিরদের কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যেমন:

১. ইবনু আব্বাস (রাঃ)-সহ কয়েকজন সাহাবী বলেন: বাক্যগুলো হল- “الطهارة” বা পবিত্রতা। ৫টি শরীরের সাথে সম্পৃক্ত আর ৫টি মাথার সাথে সম্পৃক্ত।

মাথার সাথে সম্পৃক্তগুলো হচ্ছে: ১. গোঁফ খাট করা, ২. কুলি করা, ৩. নাক পরিস্কার করা ৪. মিসওয়াক করা এবং ৫. মাথা সিঁথি করা।

শরীরের সাথে সম্পৃক্তগুলো হচ্ছে: ১. নখ কাটা, ২. নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করা, ৩. খাৎনা করা, ৪. বগলের পশম তোলা এবং ৫. শৌচকার্য করা।

এ কথা সহীহ মুসলিমের হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল। (সহীহ মুসলিম হা: ২৬১)

হাসান বসরী বলেন: তাঁকে পরীক্ষা করেছেন কতগুলো নির্দেশ দ্বারা; তিনি তাতে ধৈর্য ধারণ করেছেন। যেমন, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি। (তাফসীর ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, ৩৬০)

কেউ বলেছেন, বাক্যগুলো হল কতগুলো আদেশ ও নিষেধ। (তাফসীরে সা ‘দী, পৃঃ ৪৫, তাফসীরে মুয়াসসমার: ১৯)

সঠিক কথা হল- বাক্যসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরীয়তের বিধি-বিধান। যেমন হজ্জ ও হিজরতের বিধান এবং নমরুদের আগুনে নিক্ষেপ ইত্যাদি।

তবে হাফিয ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন: আমার কাছে গ্রহণযোগ্য কথা হল আল্লাহ তা ‘আলা যেসকল বাক্য দ্বারা ইবরাহীমকে পরীক্ষা করেছেন তা পরেই উল্লেখ করে দিয়েছেন অর্থাৎ ইবরাহীমকে আল্লাহ তা ‘আলা বললেন- “আমি তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য ইমাম বা নেতা বানাবো।

ইবরাহীম (আঃ) নিজ বংশধরের জন্য দু ‘আ করলেন। আল্লাহ তা ‘আলা জবাবে বললেন, কোন যালিমকে আমি ‘মিল্লাতে ইবরাহীমের ইমামতের দায়িত্বে নিয়োগ করব না।”

“আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবে না” অর্থাৎ আল্লাহ তা ‘আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর দু ‘আ কবূল করে তাঁর বংশে নবুওয়াত ও কিতাব দান করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ)

“তার বংশধরদের দিলাম নবূওয়াত ও কিতাব।” (সূরা আনকাবুত ২৯:২৭)

তাই আল্লাহ তা ‘আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর পরবর্তীতে যত নাবী ও কিতাব প্রেরণ করেছেন সবই তাঁর বংশধরের মাঝেই প্রেরণ করেছেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তা ‘আলার কাছে এত মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বংশে যারা জালিম ও মুশরিক হবে তাদের কেউ আল্লাহ তা ‘আলার এ প্রতিশ্র “তি পাবে না। যদি ঈমান ও সৎ আমল না থাকে তাহলে বাপ-দাদা যত বড় নাবী বা ওলী হোক আল্লাহ তা ‘আলার নিকট তার কোন মূল্য নেই। নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যার আমল তাকে পিছিয়ে দিয়েছে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম হা: ২৬৯৯)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ঈমানের দিক দিয়ে মানুষ যত বড় তার পরীক্ষাও তত বড় হয়ে থাকে।

২. কোন যালিম ও মুশরিক ইসলামী খেলাফতের উপযুক্ত নয়।

৩. যারা ঈমান, আমল, ইলম ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের নিকট থেকে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্র “তি নেয়া যাবে।

৪. নিজের ঈমান ও আমল না থাকলে বংশ মর্যাদা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।